ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 225-232
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.453

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ: ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও বর্তমান প্রাসঙ্গিকতা

অজিত মাঝি, *গবেষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 05.04.2026; Accepted: 09.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Rabindranath's thoughts on nationalism evolved during an era characterized by colonial hegemony and the rise of aggressive nation-states. While he championed the cultural and spiritual awakening of colonized societies, he nonetheless subjected political nationalism to scathing criticism whenever it degenerated into a narrow, exclusionary, and mechanistic form of collective identity. In Rabindranath's view, such nationalism jeopardized the very moral and human foundations of society by prioritizing power, uniformity, and material progress over moral and spiritual development. This paper analyzes the concept of nationalism and internationalism embedded in the thought of Rabindranath Tagore—situating it within its historical context—and evaluates its relevance in the contemporary world. Writing during the late nineteenth and early twentieth centuries, Tagore witnessed the expansion of colonial rule, the growing dominance of the modern nation-state, and the rise of nationalist movements. While he supported the cultural and intellectual awakening of colonial societies, he expressed deep skepticism whenever political nationalism assumed an aggressive, exclusionary, or mechanistic form. This study analyzes Rabindranath's critique of nationalism and his view on internationalism, as articulated in his essays, lectures, and literary works; in particular, it highlights his profound concern that the 'Nation' or 'Nation-State'—functioning as an organized power structure—often suppresses individual liberty, moral values, and cultural diversity. In Rabindranath's view, true freedom did not reside solely in political sovereignty, but rather depended upon the cultivation of a humane, ethical, and spiritually enriched society. Underlying this perspective was a far-reaching humanist philosophy that transcended national boundaries, emphasizing harmony, mutual cooperation, and the unity of all humanity.

Keywords: Rabindranath Tagore, Nationalism, Internationalism, Colonialism, Humanism

সমগ্র বাংলাভাষী জনগোষ্ঠীর চেতনা ও সংবেদনশীলতায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁদের অস্তিত্বেরই এক পরম নির্ভর ও অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে বিরাজমান। ভারত তথা বিশ্ববাসীর কাছে তাঁর প্রধান পরিচয় হলো একজন দূরদর্শী বিশ্ব কবিরূপে যার বিরল প্রতিভা আজও সকল মানুষের কাছে সমানভাবে সমাদৃত। তিনি ছিলেন এমন এক ব্যক্তিত্ব, যিনি তাঁর যাবতীয় চিন্তা, ভাবধারা ও দর্শনকে বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন। তাই তাঁকে কেবল একজন কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক কিংবা শিল্পী হিসেবে সীমাবদ্ধ না রেখে, তাঁকে 'কর্মযোগী' রবীন্দ্রনাথ

হিসেবে অভিহিত করাই অধিকতর যথার্থ বলে বিবেচনা করা হয়। চার-দেয়ালের শিক্ষাব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে প্রকৃতির কোলে, এক মুক্ত পরিবেশে একটি শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে এবং 'তপোবন' দর্শনকে রূপায়িত করতে তিনি শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এছাড়াও, তিনি গ্রামবাসীদের দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা দূরীকরণের বিষয়টি কেবল চিন্তাভাবনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি; বরং কুষ্টিয়ার শিলাইদহে অবস্থানকালে তিনি কৃষকদের জন্য একটি সমবায় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। পরবর্তীতে, শ্রীনিকেতনে তিনি কৃষি ও কুটির শিল্পের বিকাশের মাধ্যমে স্বাবলম্বিতা অর্জনের শিক্ষা প্রদান করেছিলেন। জাতি, ধর্ম ও বর্ণের ভেদাভেদের ঊর্ধ্বে উঠে তিনি মানবজাতির একতায় বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি বিশ্বভারতীকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পাণ্ডিত্যের এক মিলনক্ষেত্র হিসেবে গড়ে তুলেছিলেন। ঠিক এই কারণেই তিনি অনন্য— কেননা তিনি তাঁর কর্মের মাধ্যমেই নিজের ব্যক্তিগত জীবনদর্শনের প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই যুগের বাংলায়, এই পরিবারটি সংস্কৃতি, শিল্পকলা, সাহিত্য এবং সমাজ সংস্কারের এক কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ভূমিকা পালন করত। ঠাকুর পরিবার ছিল অত্যন্ত বিত্তশালী ও উচ্চশিক্ষিত; ভারতীয় ঐতিহ্যের পাশাপাশি তাঁরা পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এবং আধুনিক বিজ্ঞান ও জ্ঞানের চর্চা ও অনুশীলনেও সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এমন এক সময়ে— বিশেষত ১৮৬১ সালে— জন্মগ্রহণ করেছিলেন, যখন বাংলার নবজাগরণ বা 'বেঙ্গল রেনেসাঁ' ছিল তার স্বর্ণশিখরে। সমাজ সংস্কার, সাহিত্য এবং রাজনীতির অঙ্গনে তখন নতুন ভাবধারার এক প্রবল জোয়ার বয়ে যাচ্ছিল। তাঁর পারিবারিক পরিবেশ তাঁর মনে ভারতীয় চেতনা ও সংস্কৃতির প্রতি এক গভীর শ্রদ্ধাবোধ সঞ্চারিত করেছিল। একেবারে শৈশব থেকেই রবীন্দ্রনাথের অন্তরে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবোধ বিকশিত হতে শুরু করেছিল। বর্তমান সময়ে যখন বিভাজনের রাজনীতি সমগ্র বিশ্বের উপর আছড়ে পড়ছে, ধর্মীয় বিভাজন চরম আকার ধারণ করেছে এবং উগ্র ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ প্রবল শক্তি নিয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে—তখন জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে তাঁর চিন্তা-ভাবনা ও দেশপ্রেম গভীর প্রাসঙ্গিকতা লাভ করে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যসাহিত্য গভীর চিন্তার স্বকীয়তায় সমুজ্জ্বল এবং তা এক প্রগতিশীল চেতনার ওপর সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। যদিও তিনি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন না তা সত্বেও তার রাজনৈতিক দর্শন, কবিতা, উপন্যাস ও গান আজও বর্তমান বিশ্বকে উগ্র জাতীয়তাবাদী ধারার মহামারী থেকে মুক্তির দিগন্ত উন্মোচন করে।

জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গি:

মূলত, বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের মধ্যেই স্থানীয় ও বৈশ্বিক— উভয় রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে এক আমূল রূপান্তর সাধিত হয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতা, গণ-অসন্তোষ এবং আত্মপরিচয়ের বহুমুখী অন্বেষা ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনীতিকে কলুষিত করে তুলেছিল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলির মধ্যে মতপার্থক্য ও দূরত্বের এক বিশাল খাদ সৃষ্টি হয়েছিল। এই প্রেক্ষাপটেই বিশ্ব এক বিশ্বযুদ্ধের প্রলয় গর্জনের সম্মুখীন হয়েছিল। আধুনিকতার যেসব মহৎ আখ্যান এতদিন ধরে প্রাধান্য বিস্তার করে ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তেই তা খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে ভেঙে পড়ছিল। রেনেসাঁ-পরবর্তী বিশ্বে ইউরোপই রচনা করেছিল মানবতাবাদ, আধুনিকতা, স্বাধীনতা ও সাম্যের মতো আখ্যানগুলো; অথচ সেই ইউরোপেরই হাতে জন্ম নিয়েছিল মারণাস্ত্রের অসহনীয় গর্জন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার অনেক আগেই, 'রোমান্টিক' রবীন্দ্রনাথের চোখের সামনে এক নতুন বিশ্ব— এবং এক নতুন ভারত—উন্মোচিত হতে শুরু করেছিল। রবীন্দ্রানাথ এশিয়া আফ্রিকার উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলিতে য়ুরোপের বড় বড় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির নগ্ন শোষণ-শাসন, লুণ্ঠন , অত্যাচার ইত্যাদির মত ভয়াবহ দিক প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁর যৌবনের একেবারে সূচনাকাল থেকেই। সাম্রাজবাদের যে বীভৎসরুপ

সে সম্পর্কে তাঁর প্রথম থেকেই স্পষ্ট ধারণা ছিল। এই সময়ে তিনি 'ভারতী' ও 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত রাজনৈতিক প্রবন্ধগুলিতে য়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে তাদের ধিক্কার জানিয়েছিলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের কারণ বুঝতে গিয়ে তিনি লক্ষ্য করেছিলেন এশিয়া ও আফ্রিকার বাজার ও উপনিবেশ দখলকে কেন্দ্র করে বৃহৎ সাম্রাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধ। কিন্তু এই বৃহৎ সাম্রাজ্যগুলির পিছনে যে শক্তি ক্রিয়াশীল ছিল তাহলো জাতীয়তাবাদ বা ন্যাশানালিজম। আত্মশক্তি (১৩১২) বইয়ের প্রবন্ধগুলোয় রবীন্দ্রনাথ বুঝতে চাইলেন 'নেশন' ও 'ন্যাশনালত্ব'–এর সারবস্তু। তাঁর কাছে নেশন হলো 'একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ'। যার এক বাহু অতীতে বাড়ানো, অন্য বাহু প্রসারিত বর্তমানে। সামষ্টিক অতীত ও স্মৃতির যোগসূত্রকে মান্য করে জানালেন, 'অতীতের গৌরবময় স্মৃতি ও সেই স্মৃতির অনুরূপ আদর্শ' আসল জিনিস। কারণ, দুঃখে–সুখে একসঙ্গে থাকার অনুভূতি জনসাধারণকে 'একটি একীভূত নিবিড় অভিব্যক্তি দান করে'। লক্ষ্য করবার বিষয় রবীন্দ্রানাথ কোথাও জাতি কিংবা জাতীয়তাবাদ শব্দ দুটি ব্যবহার করেন নি। পরিবর্তে তিনি নেশন এবং ন্যাশানালিজম শব্দ দুটি ব্যবহার করেছেন। তিনি এই মত পোষণ করতেন যে, জাতি (nation) এবং জাতীয়তাবাদ (nationalism)— উভয়ই সম্পূর্ণ আধুনিক ও পাশ্চাত্য ধারণা; এগুলোর একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যমুখী উদ্দেশ্য রয়েছে এবং এদের গঠনপ্রক্রিয়ায় 'যান্ত্রিক যৌক্তিকতা' (instrumental rationality) এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের গঠনের মাধ্যমেই জাতির উদ্দেশ্য সার্থক রূপ লাভ করে। কিন্তু, রাষ্ট্রকে বাহ্যত জনকল্যাণমুখী মনে হলেও, এটি মূলত এমন এক সমান্তরাল মতাদর্শ দ্বারা পরিচালিত, যা দুটি মূলনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত: পরাধীনতা ও দমন-পীড়ন। রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হলো সকল নাগরিককে আনুগত্যের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখা এবং দমন-পীড়নের বিবিধ কৌশলের মাধ্যমে তাদের মনে সুনির্দিষ্ট কিছু ধারণাকে 'স্বাভাবিক' হিসেবে গেঁথে দেওয়া। কবির অভিমত ছিল যে, যখনই কোনো নেশন নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে— এবং তা করতে গিয়ে অন্যদের ওপর বলপ্রয়োগ শুরু করে— তখন তা মানবজাতির জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। এর কারণ হলো, তখন মানুষ ক্ষমতার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিতে শুরু করে এবং জাতীয়তাবাদী ভাবনার প্রতি এক চরম আচ্ছন্নতায় মত্ত হয়ে তাদের স্বভাব যান্ত্রিক হয়ে ওঠে। ফলস্বরূপ, সমাজের মানবিক দিকটি ধীরে ধীরে ম্লান হতে থাকে। তিনি একক নেশন বা জাতির ওপর আস্থা রাখেননি। সমাজে নানা রকম বিভক্তি বিদ্যমান থাকায় নেশন নির্মাণ সম্ভব নয়- এটাই ছিল তার অনাস্থার মূল কারণ। তাঁর মতে, নেশন হলো 'ভৌগলিক অপদেবতা' (Geographical Demon)।[১] রবীন্দ্রনাথ 'নেশন' এবং 'নেশন' স্টেট' এই দুইয়েরই বিরোধী ছিলেন। প্রথমদিকে তার ধারণা ছিল, 'নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ'। কিন্তু পরে নেশনকে একটি অস্বাভাবিক অবস্থা হিসেবে দেখেছেন, যা জনগণকে 'যান্ত্রিক প্রয়োজনে' সংঘবদ্ধ করে। তাঁর মতে, ভারতে নেশন নির্মাণ সম্ভব নয় পশ্চিমের নেশন ও ন্যাশনালিজম ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে খাটবে না। কারণ, ইউরোপে শাসক-শোষিতের যে ভেদ ঘটেছিল, সেটা জাতিগত বিভেদ নয়; শ্রেণিগত ভেদ। কিন্তু ভারতবর্ষে ভেদ ধর্ম ও জাতির নামে। তার মতে, দুর্বল ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে জাতি গঠনের চেষ্টা এসব ভেদবুদ্ধিকে আরো বাড়িয়ে দেবে। রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত ছিল বিভিন্ন নেশনের ভিন্নতার, বৈচিত্রের। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্য, সকলকে এক সূত্রে বাঁধা এটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে নেশনের মূল কথা। তাই তো তিনি বলছিলেন, মানুষ বাঁধা নিয়েই বিষয়, তাকে নেশন বা ন্যাশানালিটি যাই বলা হোক না কেন। কিন্তু যখন তিনি দেখলেন, যে 'নেশন' এর ধারণাটি যত বিকশিত হচ্ছে তার সাথে সাথে বিভিন্ন জাতির মধ্যেও এক ধরণের রাষ্ট্রীয় স্বার্থপরতাও বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন 'নেশন' সম্পর্কে তাঁর ধারণা সম্পূর্ণ এক বিপরীত অবস্থান নেয়।

ইউরোপীয় সভ্যতার ইতিহাস অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ জাতীয় স্বার্থপরতা ও জাতিগত আধিপত্যের উৎস খুঁজে পেয়েছিলেন পশ্চিমী জাতিয়তাবাদের ভাবধারার মধ্যে। তিনি ইউরোপীয় নেশনগুলির এই উগ্র ও জঙ্গি জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ১৯১৬ সালে জাপান ও আমেরিকায় যে তিনটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা পরবর্তীকালে 'ন্যাশানালিজম' নামক ইংরাজি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। সেখানে রবীন্দ্রনাথ নেশনের সংজ্ঞা দিয়েছেন যে,

> "A nation in the sense of the political and economic union of a people, is that aspect which a whole population assumes when organized for a mechanical purpose. Society as such has no ulterior purpose. It is an end in itself."[২]

অর্থাৎ নেশন হলো রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে একত্রিত হওয়া জনসমষ্টি যা যান্ত্রিক প্রয়োজনে সংগঠিত। আর এই যান্ত্রিক প্রয়োজনটা হলো সেই নির্দিষ্ট জনসমষ্টির যা নিজেকে নেশন হিসাবে দাবি করে। যান্ত্রিক কারণ তা সংবদ্ধ স্বার্থপরতার উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তা সমাজের রাজনৈতিক উপরিকাঠামোকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে অবদান রাখে। ১৯১৬ সালে রবীন্দ্রনাথ জাপান সফর করেন। জাপানের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল দ্বারা গভীরভাবে অভিভূত হলেও, জাপানি জনগণের আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ কবিকে শঙ্কাগ্রস্ত করে তুলেছিল। ফলস্বরূপ, টোকিও ইম্পেরিয়াল ইউনিভার্সিটি হলে বক্তৃতা প্রদানকালে তিনি গভীর বেদনার সাথে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন:

> "This political civilisation is scientific, not human.... It betrays its trust, it waves it meshes of lies without shame, it enriches gignatic idols of greed in its temples, taking great pride in the costly ceremonials of its worship, calling this patriotism."[৩]

রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম ও স্বদেশী সমাজ সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনা:

রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেমে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল 'স্বদেশী সমাজ-এর ধারণা, যার ভিতরে প্রোথিত রয়েছে আত্মশক্তির ধারণা ও আত্মনির্ভরতা। ১৯০৪ সালে বঙ্গভঙ্গবিরোধী আন্দোলনের সূচনাপর্বে রবীন্দ্রনাথ দেশবাসীকে আহ্বান করেছিলেন এই 'স্বদেশী সমাজ' গড়ে তোলার জন্য। স্বদেশের প্রতি ভালোবাসার ধারণাটি ব্যক্ত করার লক্ষ্যে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনায় বিচিত্র সব পরিভাষা ব্যবহার করেছেন— যেমন: দেশপ্রেম, স্বদেশপ্রেম, দেশভক্তি, দেশাভিমান এবং স্বদেশচেতনা। তবে, এগুলোর কোনোটিকেই তিনি 'জাতীয়তাবাদ' শব্দটির সমার্থক বা অনুবাদ হিসেবে ব্যবহার করেননি। যখনই তিনি 'জাতীয়তাবাদ'-কে নির্দেশ করতে চেয়েছেন, তখন 'ন্যাশনালিজম' শব্দটি ছাড়া অন্য কোনো শব্দ তিনি ব্যবহার করেননি। রবীন্দ্রনাথ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ বা সংকীর্ণ দেশপ্রেমে কোনোভাবেই আস্থা রাখতে পারেন নি। ১৯০৪ সালে 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'দেশের কথা' প্রবন্ধে খুব স্পষ্টভাবেই তিনি এ বিষয়ে তাঁর ভাবনার কথা জানিয়েছেন— "স্বাদেশিকতার ভাবখানা এই যে, স্বদেশের ঊর্ধ্বে আর কিছুকেই স্বীকার না করা।... যেখানে স্বদেশের স্বার্থ লইয়া কথা সেখানে সত্য, দয়া, মঙ্গল সমস্ত নিচে তলাইয়া যায়। স্বদেশীয় স্বার্থপরতাকে ধর্মের স্থান দিলে যে ব্যাপারটা হয় তাহাই প্যাট্রিয়টিজম শব্দের বাচ্য হইয়াছে।"[৪] তিনি একক নেশন বা জাতির ওপর আস্থা রাখেননি। সমাজে নানা রকম বিভক্তি বিদ্যমান থাকায় নেশন নির্মাণ সম্ভব নয়— এটাই ছিল তার অনাস্থার মূল কারণ। ইউরোপ ও ভারতের সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ পর্যবেক্ষণ করেন যে,

ইউরোপীয় সমাজ রাষ্ট্র-কেন্দ্রিক; পক্ষান্তরে ভারতীয় সমাজ সমাজ-কেন্দ্রিক। তাই তিনি নেশনের বদলে প্রতিষ্ঠা করতে বলেছেন স্বদেশী সমাজ। যার মূল চালিকাশক্তি হবে পল্লী উন্নয়ন, আত্মশক্তি ও আত্মনির্ভরশীলতা। তাঁর প্রবন্ধ 'স্বদেশী সমাজ'-এ রবীন্দ্রনাথ শাসনব্যবস্থার এই পদ্ধতিটিকে, যাকে তিনি 'নেশন'-এর একটি বিকল্প বলে গণ্য করেছিলেন তাঁর নাম দিয়েছিলেন 'সমাজতন্ত্র'। আশিস নন্দী পর্যবেক্ষণ করেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ ভারতের 'উচ্চ সংস্কৃতির' আদর্শকে আঁকড়ে ধরে 'জাতি' বা 'নেশন'-এর ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন; অন্যদিকে গান্ধী, সাধারণ মানুষের লোকধর্মের আদর্শে অবিচল থেকে, খোদ জাতীয়তাবাদী রাজনীতির পরিসরের ভেতর থেকেই 'নেশন'-এর একটি সমালোচনা গড়ে তুলেছিলেন। তথাপি, শেষ পর্যন্ত উভয়েই একই গন্তব্যে উপনীত হয়েছিলেন— রাষ্ট্র-বিরোধী এমন এক মতাদর্শে, যা দেশপ্রেমকে স্থান দিলেও জাতীয়তাবাদের জন্য কোনো অবকাশ রাখে না।[৫]

রাবীন্দ্রিক উপন্যাসে জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদ:

রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক দর্শনের মূল ভিত্তি হলো আন্তর্জাতিকতাবাদ। পৃথিবীতে যখন মানবজাতির প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল, তখন দেশ বা মহাদেশগুলোকে বিভক্ত করার মতো কোনো সীমারেখা বা সীমানা বিদ্যমান ছিল না। জাতি, গোষ্ঠী, ধর্ম এবং বর্ণ— এ সবই মানুষের সৃষ্ট নিছক কাল্পনিক বিভাজন মাত্র। তাই, এই বিভেদগুলোর ভিত্তিতে কোনো সংঘাতে লিপ্ত হওয়া কিংবা বিবাদের বীজ বপন করা সম্পূর্ণ অর্থহীন। ধর্ম, বর্ণ, মতাদর্শ বা জাতীয়তাবাদের নামে মানবজাতিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপদলে বিভক্ত করার তীব্র বিরোধিতা তিনি করেছিলেন; দুটি বিশ্বযুদ্ধই এ কথার অকাট্য প্রমাণ হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে যে, তাঁর আশঙ্কাগুলো বিন্দুমাত্র অমূলক ছিল না। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, একমাত্র আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্ববোধই মানবজাতির প্রকৃত অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করতে পারে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর তিনটি রাজনৈতিক উপন্যাসে— যথা গোরা (১৯০৯), ঘরে বাইরে (১৯১৬) এবং চার অধ্যায় (১৯৩৪)— তিনি ভারতে উদ্ভূত কঠোর ও উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে এক সমালোচনামূলক প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। 'গোরা' চরিত্রের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমকালীন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতাদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন, যা সেই আন্দোলনের অবশ্য-পালনীয় আদর্শ হওয়া উচিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ এটিই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন যে, যখন জাতীয়তাবাদ কেবল কোনো নির্দিষ্ট জাতি, বর্ণ কিংবা ধর্মকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে, তখন তা জাতীয়তাবাদের এক সংকীর্ণ, বিকৃত ও বিভেদ সৃষ্টিকারী রূপ ধারণ করে। এহেন জাতীয়তাবাদ সমগ্র জাতির ওপর অভিশাপ হয়ে দাঁড়ায়। ফলস্বরূপ, রবীন্দ্রনাথ সর্বদা এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন যে, জাতীয়তাবাদের অবশ্যই একটি আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা বাঞ্ছনীয়। তাঁর উপন্যাস 'গোরা'-র মাধ্যমে তিনি তৎকালীন ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাদের এই শিক্ষাই দিতে প্রয়াস করেছিলেন যে— স্বদেশী আন্দোলনের সাফল্য নিশ্চিত করতে হলে জাতি, ধর্ম বা বর্ণ-নির্বিশেষে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে সংগ্রাম করতে হবে। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, ভারতের পরাধীনতার জন্য বিদেশি শক্তির আগ্রাসী মনোভাবের চেয়ে— বরং নিজেদের কর্তব্য পালনে ও দেশের সেবায় আমাদের নিজস্ব ব্যর্থতাই অনেক বেশি দায়ী ছিল। গোরা উপন্যাসের প্রধান চরিত্র 'গোরা'-র মধ্য দিয়ে তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের হিন্দু-কেন্দ্রিক গোঁড়ামি থেকে এক আন্তর্জাতিক মানবতাবাদের দিকে উত্তরণের চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি জোরালোভাবে অভিমত প্রকাশ করেন যে, জাতীয়তাবাদের ধারণাটি কেবল হিন্দু পরিচয়ের ওপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়; বরং জাতি গঠনের মূল ভিত্তি নিহিত রয়েছে ভারতের প্রতিটি মানুষের পারস্পরিক মানবিক বন্ধনের মধ্যে। ফলস্বরূপ, এই উপন্যাসে আমরা দেখতে পাই যে—যখন 'গোরা' উপন্যাসের

একেবারে শেষে তার প্রকৃত বংশপরিচয় জানতে পারে এবং উপলব্ধি করে যে সে আসলে আইরিশ পিতামাতার সন্তান— তখন তার সমস্ত সংশয়, দ্বিধা এবং মিথ্যা অহংকার বিলীন হয়ে যায়। এই উপন্যাসে দেখা যায়, গোরার মা আনন্দময়ী, যে তার আসল মা নয়, যার কাছে সে বড় হয়ে উঠেছে। নিজের জন্মবৃত্তান্ত জানার পর সে আনন্দময়ীর পদতলে আশ্রয় নিয়ে বলেন,

> "মা, তুমিই আমার মা। যে মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলুম তিনিই আমার ঘরের মধ্যে এসে বসেছিলেন। তোমার জাত নেই, বিচার নেই, ঘৃণা নেই-তুমি শুধু কল্যাণের প্রতিমা। তুমিই আমার ভারতবর্ষ।"[৬]

এই বোধের মধ্য দিয়েই গোরার মধ্যে হিন্দুত্ববাদী সংস্কার থেকে বিশ্বমানবতাবোধের উত্তরন ঘটে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ আনন্দময়ীর মধ্য দিয়ে দেখাচ্ছেন যে, এই হলো আমাদের ভারতমাতা। যাঁর কাছে জাত-ধর্ম-বর্ণের ভেদাভেদ নেই, যে শুধুমাত্র মানবধর্মের ও মানবকল্যাণের প্রতীক। রবীন্দ্রনাথ এই উপন্যাসে আনন্দময়ীকে ভারতমাতার প্রতীকরূপে উপস্থাপিত করেছেন।

জাপান যাওয়ার আগের বছর, ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের অপর একটি উপন্যাস 'ঘরে বাইরে'। এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র নিখিলেশের মুখ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ এই বার্তা দিয়েছিলেন যে,

> "দেশকে সাদাভাবে সত্যভাবে দেশ বলেই জেনে, মানুষকে মানুষ বলেই শ্রদ্ধা করে, যারা তার সেবা করতে উৎসাহ পায় না, চীৎকার করে মা বলে, দেবী বলে মন্ত্র পড়ে যাদের কেবলই সম্মোহনের দরকার হয়, তাদের সেই ভালোবাসা দেশের প্রতি তেমন নয় যেমন নেশার প্রতি।"[৭]

বর্তমান যুগে তাঁর উপন্যাস 'ঘরে-বাইরে'-তে যে সন্দীপ চরিত্রটি সৃষ্টি করেন তা আজকের তা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক বলেই প্রতিভাত হয়। বস্তুত, তিনি হলেন সমসাময়িক জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতাদের এক আদর্শ প্রতিরূপ— এমন একজন, যিনি ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ান এবং শেষ পর্যন্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা উসকে দিতেও বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন না।

রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র জাতীয়তাবাদ বিরোধী বক্তৃতাই তুলে ধরেন নি, একই সঙ্গে তিনি বিশ্বমানবতার বাণী প্রচার করেছিলেন। পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদের তীব্র সমালোচনা করলেও সামগ্রিকভাবে তিনি মানবতার ওপর আস্থা রেখেছেন। তাই তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মিলনের কথা বলেছেন। আর এই জন্যই তার জাতীয়তাবাদ বিরোধী বক্তৃতার এক জায়গায় বলেছেন,

> "...Then again, we have to consider that the West is necessary to the East. We are complementary to each other because of our different outlooks upon life which have given us different aspects of truth. Therefore, if it be true that the spirit of the West has come upon our fields in the guise of a storm it is nevertheless scattering living seeds that are immortal. And when in India we become able to assimilate in our life what is permanent in Western civilization we shall be in the position to bring about a reconciliation of these two great worlds. Then will come to an end the one-sided dominance which is galling."[৮]

১৯০৮ সালে A.M BOSE কে লেখা একটি চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন "আমি হীরের দামে কাঁচ কিনব না এবং আমি বেঁচে থাকতে দেশপ্রেমকে মানবতার ওপরে জয়ী হতে দেব না।"[৯] রবীন্দ্রনাথের কাছে দেশপ্রেম মূলত মানবপ্রেম; এবং তিনি নিঃসঙ্কোচে বিশ্বভ্রাতৃত্বের আদর্শ প্রচার করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন, জাতীয়তাবাদ, উগ্র জাতীয়তাবাদের নামে বিচ্ছিন্নতাকেই প্রশ্রয় দেয়। তাই তিনি বিশ্বমানবতার উপর আস্থা রেখে আন্তর্জাতিকতাবাদের প্রচার করেন। তাঁর এই আন্তর্জাতিক বা বিশ্বজনীন মানবতাবাদের অধিকতর তাৎপর্যপূর্ণ এক ব্যাখ্যা তাঁর ১৯৩০ সালের 'হিবার্ট বক্তৃতা'-র মধ্যে বিশেষত 'The Religion of Man' শীর্ষক প্রবন্ধে—পাওয়া যায়; সেই বক্তৃতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন মানুষ তার প্রকৃত সত্তাকে তখনই আবিষ্কার করে, যখন সে তার প্রাত্যহিক স্বার্থপরতা ও জাগতিক বিষয়গত ক্ষুদ্রতাকে অতিক্রম করে বিশ্ব-ইচ্ছার অধিকতর সান্নিধ্যে উপনীত হয় এবং নিজেকে 'বিশ্বাত্মা'-র সঙ্গে মেলাতে সমর্থ হয়। তাঁর ভাষায়,

> "Man misses himself when isolated; he finds his own larger and truer self in his wide human relationship. His multicellular body is born and it dies; his multi-personal humanity is immortal. In this ideal of unity, he realizes the eternal in his life and the boundless in his love."[১০]

মূল্যায়ন:

আজকের এই আধুনিক বিশ্বেও আমরা দেখতে পাই, জাতীয়তাবাদ নানা বেশে মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। রাজনীতি, ধর্ম, ক্রীড়া কিংবা আধিপত্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা— যে ক্ষেত্রই হোক না কেন, জাতীয়তাবাদ সেখানে রূপ পরিগ্রহ করে; কখনো ভারত, বাংলাদেশ বা পাকিস্তানে তা আগ্রাসী হয়ে ওঠে। প্রত্যেক দেশেই দেখা যায় এক ধরনের জাতীয়তাবাদী শ্রেষ্ঠত্ববোধ প্রবল হয়ে ওঠে, যা জাতিসমূহের সংস্কৃতি ও পরিচয়কে অবজ্ঞা করে এবং বৈচিত্র্যকে মুছে ফেলার প্রচেষ্টা চালায়।

রবীন্দ্রনাথ মানবতার আদর্শকে কেবল ধর্মের ঊর্ধ্বে নয়, বরং স্বয়ং জাতিরও ঊর্ধ্বে স্থান দিয়েছিলেন। জাতি ও ধর্মের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত এই দেশে এবং এই বিশ্বে তাঁর 'আন্তর্জাতিকতাবাদ' ও 'মানবতার ধর্ম'-ই হয়তো মানব মুক্তির চূড়ান্ত পথ হয়ে উঠতে পারে। বর্তমান বিশ্বে, মানুষের মধ্যে— 'আমরা' ও 'ওরা'— এই বিভাজনটি রাজনীতি ও ধর্মের সংমিশ্রণ থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই বিভাজনের বিপদসমূহ সঠিকভাবেই অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। বর্তমান সময়ে, যখন ধর্ম দ্বারা ইন্ধনপ্রাপ্ত অসহিষ্ণুতার এক আবহ সমগ্র দেশ ও বিশ্বজুড়ে ছেয়ে আছে, তখন রবীন্দ্রনাথকে— এমন এক ব্যক্তিত্ব যিনি ঠিক এই ঘটনারই সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেন— পুনরাবিষ্কার করার জন্য সম্ভবত এটিই সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক ও সংকটপূর্ণ মুহূর্ত। এটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, বিংশ শতাব্দীর অগ্রগতির সাথে সাথে জাতি ও জাতীয়তাবাদের স্বরূপ বিষয়ক চলমান বিতর্কসমূহে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশ অধিকতর প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ উগ্র জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে যে সতর্কতাবাণী দিয়েছিলেন এবং মানবতাকে আধার করে যে আন্তর্জাতিকতাবাদের পথ দেখিয়েছিলেন তা একবিংশ শতাব্দীতে যথেষ্ট গুরুত্বের দাবি রাখে তাই বর্তমান সময়েও তাঁর চিন্তাভাবনার স্মরণ করা প্রয়োজন, আর এখানেই রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিকতা।

সমসাময়িক বিশ্বে, প্রতিটি জাতিই সেই আন্তর্জাতিকতা ও বিশ্ব-সংহতির পথে অগ্রসর হওয়ার প্রয়াস চালাচ্ছে, যার স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথ দেখেছিলেন। তবুও, জাতি-রাষ্ট্রগুলো তাদের নিজস্ব স্বার্থকেই অগ্রাধিকার দিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে চলেছে; আর এই প্রক্রিয়ায় মানবতাকে গৌণ বিষয়ে পরিণত করা হচ্ছে। এমনকি বিশ্ব-রাজনীতির রবীন্দ্র-পরবর্তী যুগেও, জাতিসমূহের মধ্যকার আদর্শগত সংঘাত অব্যাহত রয়েছে। পুঁজিবাদ ও

সমাজতন্ত্রের মতো আদর্শের আড়ালে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। আবার, সন্ত্রাস দমনের নামে নির্বিচার ও অমানবিক হত্যাকাণ্ডও সংঘটিত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তি রক্ষার লক্ষ্য নিয়ে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল; কিন্তু মানবজাতির আত্মিক সংহতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে এটি কোনো তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে। এর পরিবর্তে, এটি ক্রমশ একটি মূলত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথই সেই অনন্য ব্যক্তিত্ব— স্বীয় যুগে এবং আমাদের বর্তমান যুগে— যিনি সবকিছুর ঊর্ধ্বে উঠে বিশ্বমানবগোষ্ঠীকে মানবতার ওপর আস্থা স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে ঐক্যের বার্তা প্রচার করেছিলেন।

তথ্যসূত্র:

১. সেন, বিনায়ক। জন্মভূমির ভিন্ন পাঠঃ নেশন বনাম নো-নেশন বিতর্কে রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ, এই সময়ে. Ed. আনিসুজ্জামান, প্রথমা প্রকাশন, ২০১২, ঢাকা, পৃ. ২০৩।

২. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ন্যাশানালিজম। ম্যাকমিলান এ্যাণ্ড কোম্পানী লিমিটেড, ১৯১৮, লন্ডন, পৃ. ৯।

৩. তদেব, পৃ. ৬০।

৪. রবীন্দ্র রচনাবলী দশম খণ্ড। বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৪২, ক্যালকাটা, পৃ. ৬২০।

৫. নন্দী, আশিস। দি ইলেজিটিমেসি অফ ন্যাশনালিজম: রবীন্দ্রনাথ টেগোর অ্যান্ড দি পলিটিক্স অফ সেল্ফ। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৪, দিল্লি।

৬. রবীন্দ্র রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড। বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৪২, ক্যালকাটা, পৃ. ৬৬৫।

৭. রবীন্দ্র রচনাবলী অষ্টম খণ্ড। বিশ্বভারতী প্রকাশন, ১৯৪২, ক্যালকাটা, পৃ. ১৭১।

৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। ন্যাশানালিজম। ম্যাকমিলান এ্যাণ্ড কোম্পানী লিমিটেড, ১৯১৮, লন্ডন, পৃ. ১৫।

৯. দত্ত, কৃষ্ণ এবং রবিনসন, অ্যাণ্ডরু, সিলেক্টেড লেটারস্ অফ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি প্রেস, ১৯৯৭, পৃ. ৭২।

১০. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। (১৯২১) দ্য রিলিজিয়ন অফ ম্যান। জর্জ অ্যালেন অ্যান্ড আনউইন লিমিটেড, ১৯২১, লন্ডন, পৃ. ১৫।